অধ্যায় ১০ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও প্রস্তুতি
Adopting Climate Change Impact and Preparedness

১০.১ জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব

(Climate change and its impact)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন (Global Warming) এর কারণে সকল দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও উর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়ামন্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। প্রকৃতিতে তারই প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান, আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রুদ্র রূপ ধারণ করবে না। ১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "গঙ্গোত্রী হিমবাহসংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, "গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।" এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন– শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরু প্রতিবেশ প্রভৃতি এবং এর প্রভাব সর্বোপরি মানুষসহ সকল জীবের উপরে আসন্ন বলেই প্রতীয়মান।

১০.২ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Bangladesh Context)

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। নদীপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং পানিতে লবণাক্ততা দেখা দেবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। আশংকা করা হচ্ছে এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-১৭ ভাগ এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং বাস্তুহারা হবে ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ। এ ছাড়া নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন–হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা এবং নদীতীর বা মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় **জলবায়ু অভিবাসীর অর্ধেকই হবে বাংলাদেশ থেকে**। জরুরী উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বন্যা ও ফসলের উৎপাদন নষ্ট হয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ অভিবাসী হওয়ার ঝুঁকিতে যাবে।

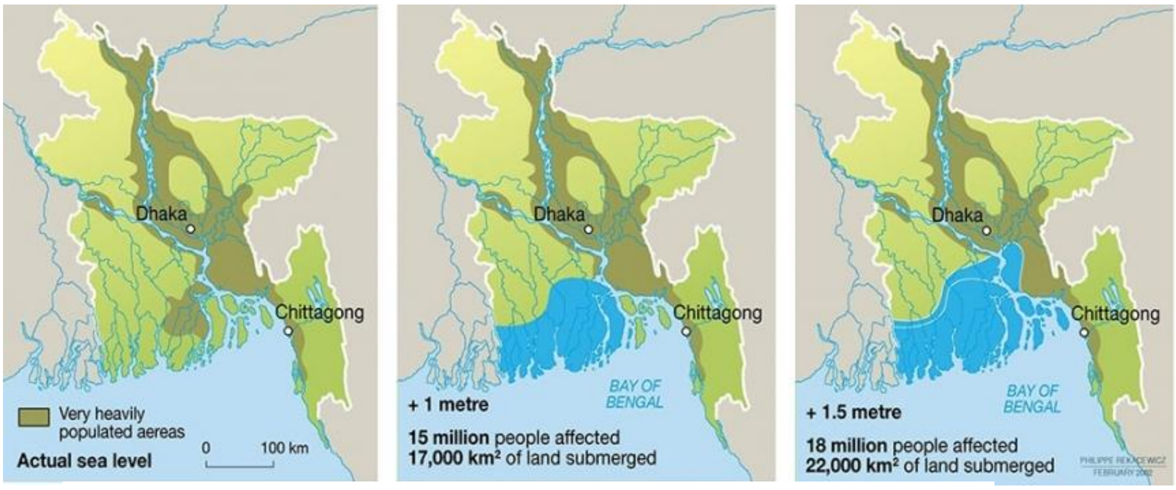

চিত্রঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাপেক্ষে প্লাবিত অঞ্চল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী তিন দশকে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জীবিকায়ন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে জলবায়ু সৃষ্ট অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে পরিণত হতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এখানকার দেশগুলো দ্রুত পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এখানে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বর্তমান সময়ের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বেশ আশঙ্কার বিষয় হলো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির আশঙ্কায় থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। আর এ কারণে এসব এলাকায় অভিবাসীদের আগমনের হার বাড়তেই থাকবে। তাই সম্ভাব্য জলবায়ু অভিবাসীদের বিষয় টিকে মাথায় রেখে অবিলম্বে নীতিনির্ধারকদের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৯ সালের অর্ধ-বার্ষিকী প্রতিবেদনের হিসাব মতে, দেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৭ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। যার বেশির ভাগই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এই দুর্যোগকে আরও বাড়িয়ে দিবে। ২০৮০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ % ভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির অনুমেয় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব হলো চাষযোগ্য জমি, মাটি এবং পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং তার পরিণতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব। এটিই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বড় কারণ।

মূল ভূখন্ড এলাকায় বাস্তুচ্যুতির প্রধান কারণ নদী ভাঙন ও বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এলাকায় নিয়মিত খরাও মানুষের বাস্তুচ্যুতির আরেকটি কারণ। ভূতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি সক্রিয় ভূ-চ্যুতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। এ কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রবণ উচ্চ মাত্রার তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম।

ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং সবুজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের হার ৮০ % পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

১০.৩ প্রেক্ষিত ভৈরব

ভৈরব পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া উচিত। সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ঝুঁকি-জোন সাপেক্ষে ভৈরবের অবস্থান নিরুপন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে করে আমরা জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারি। প্রথমত, অবস্থান বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১০.৩.১ ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসঃ

বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝূঁকি সংক্রান্ত জোনিং ম্যাপে (সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী) চারটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে ।

জোন ১ ঃ ন্যুনতম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ২ ঃ কম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৩ ঃ মধ্যম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৪ ঃ অধিক ঝূঁকিপূর্ণ

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **ভৈরব পৌরসভা "জোন ৩ঃ মধ্যম ঝূঁকিপূর্ণ"** ও **"জোন ৪ঃ অধিক ঝূঁকিপূর্ণ"** এর মাঝে অবস্থিত। অর্থাৎ ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ করা প্রয়োজন। সীমিত মাত্রার ভূমিকম্প (রিকটার স্কেল এ ৫.০ বা সমমাত্রার, যদিও এটাকে আরও পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে স্থানভিত্তিক আরও নির্দিষ্ট করা সম্ভব, সেজন্য একটি ভিন্ন সমীক্ষা প্রয়োজন) সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। অবকাঠামো নির্মানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

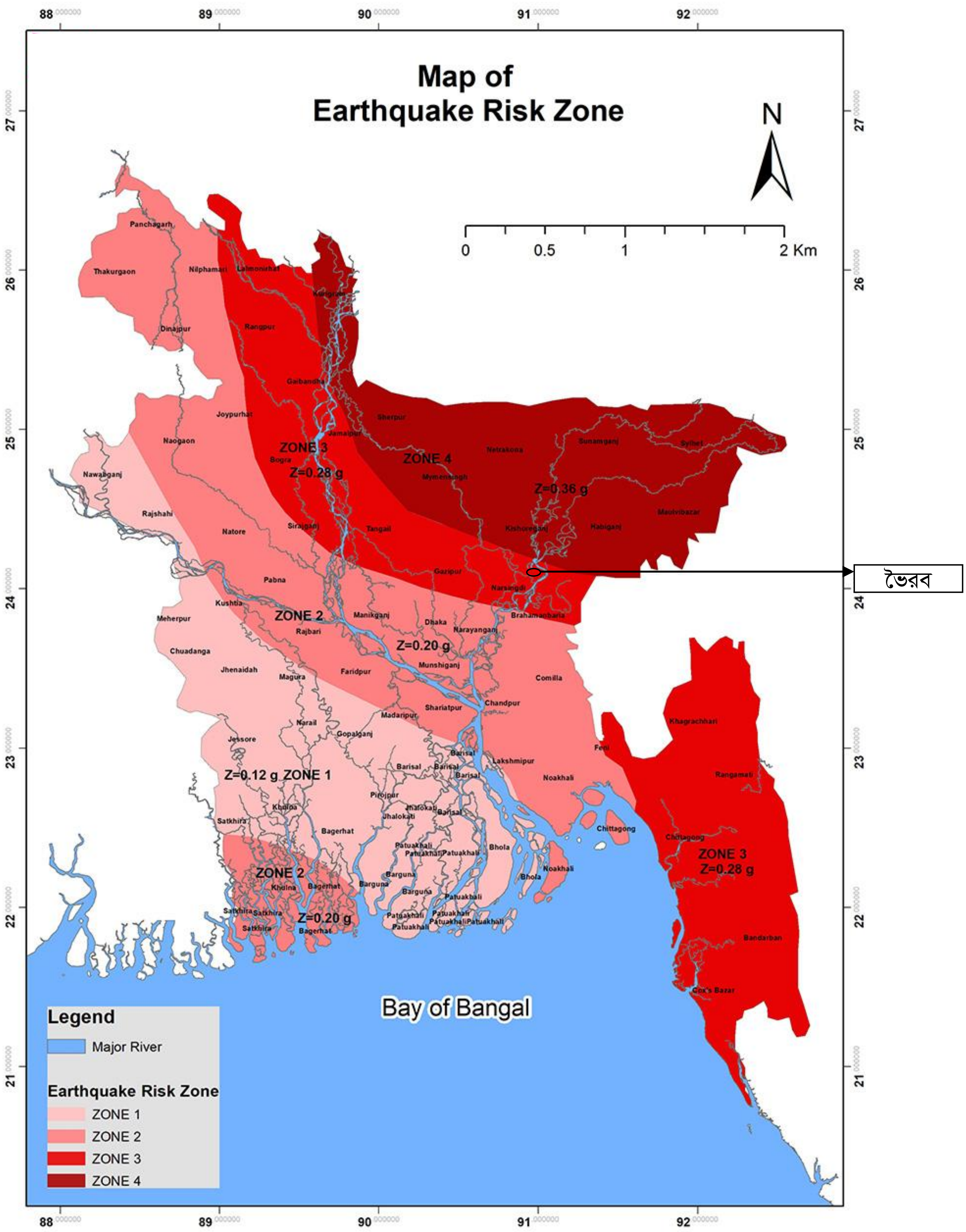

চিত্রঃ ভুমিকম্প জোনিং ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

১০.৩.২ বন্যা অঞ্চল

নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়, বাংলদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই নদীর অববাহিকা বা তদসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের বেশীরভাগ নদীর নব্যতা কম, এ কারনে সাধারন অতিবৃষ্টিই বন্যায় রুপ নেয়। তাছাড়া যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থান ভাটির দিকে এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারতে বয়ে চলা পানির নির্গমন পথ হলো বাংলাদেশ, তাই বর্ষাকলে বন্যা আমাদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন সহ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা (Comprehensive Plan).

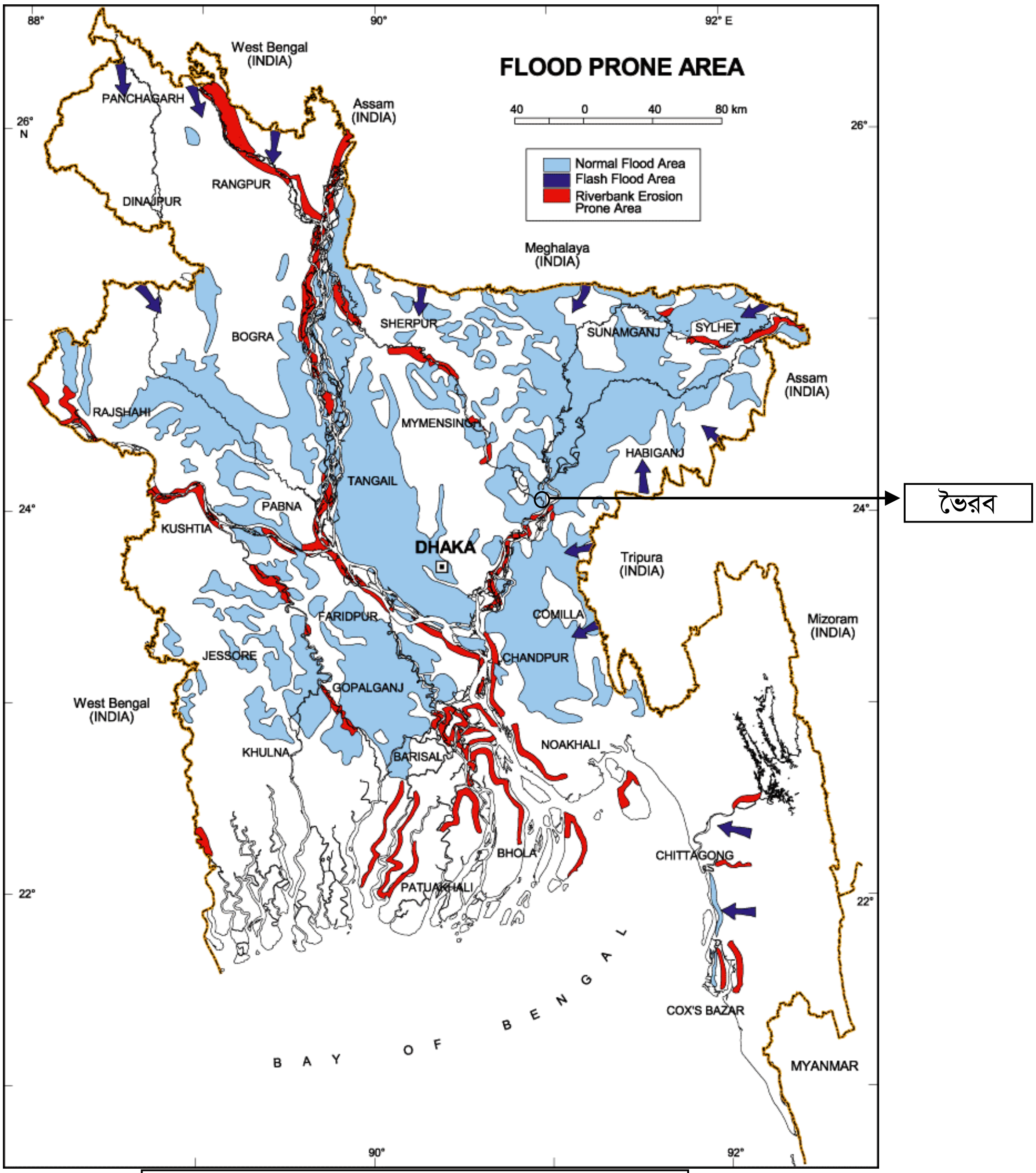

চিত্রঃ বন্যা জোনিং ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **ভৈরব পৌরসভা** এলাকা **মূলতঃ বন্যামুক্ত,** তবে নদী পার্শ্ববর্তী এলাকা **স্বাভাবিক বন্যা** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ এ এলাকায় বণ্যার প্রবণতা কম এবং নদীতে বাঁধ থাকলে এই এলাকাটি বন্যামুক্ত থাকবে বলে ধরে নেয়া যায় এবং সে কারনে উন্নয়ন কার্যক্রমের উপরে বন্যার তেমন কোন প্রভাব থাকবেনা।

১০.৩.৩ নদী-ভাঙন অঞ্চল

উপরোল্লিখিত কারনে বন্যা প্রকট হয় এবং নদী ভাঙনের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন। বর্তমানে অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত নদী-শাসনের ফলস্বরুপ আমাদের অনেক এলাকাই ভাঙনের শিকার। ম্যাপে প্রদর্শিত লাল অঞ্চলগুলোতে উচ্চমাত্রার ভাঙন দেখা যায়।

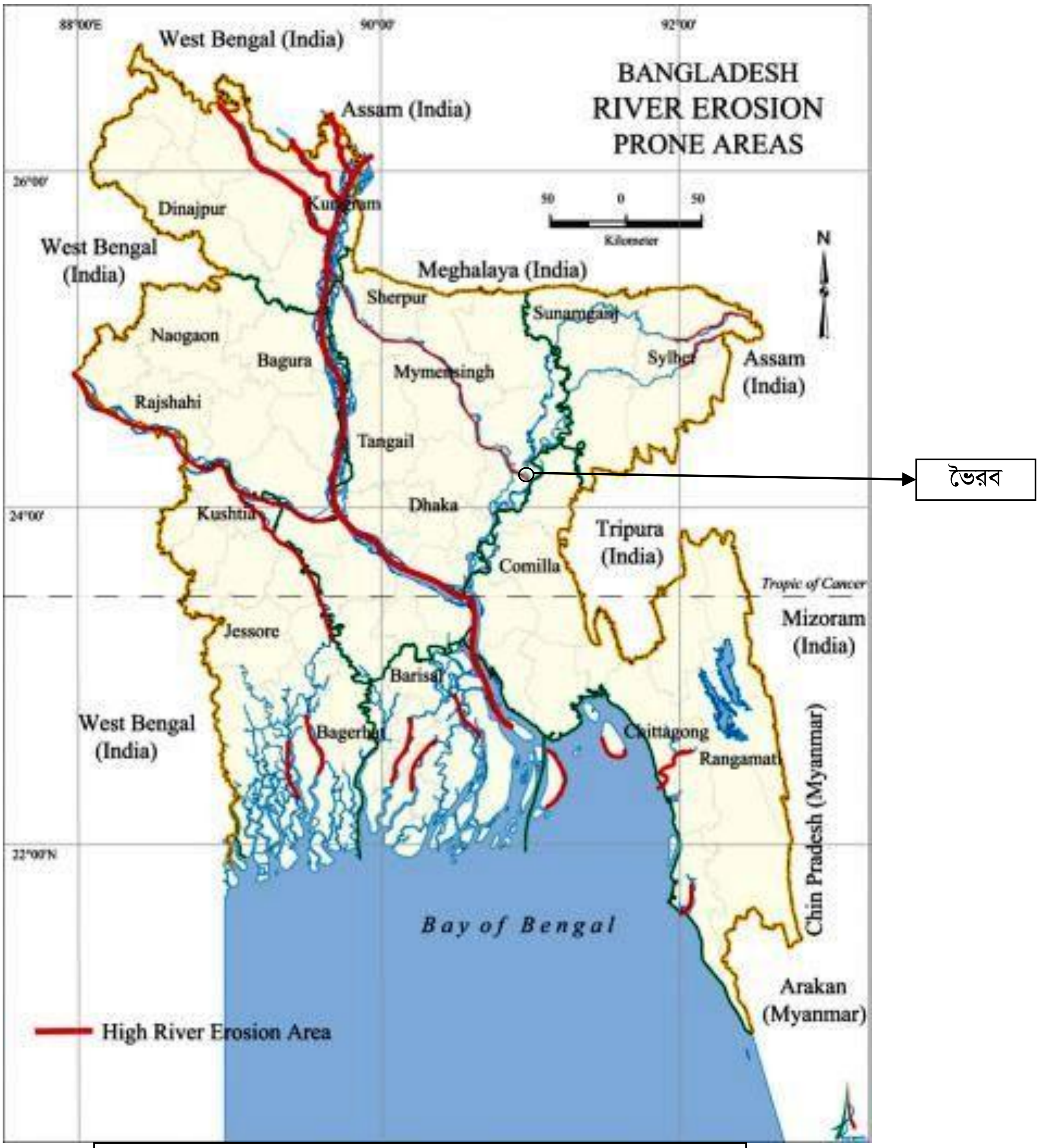

চিত্রঃ বাংলাদেশের নদী-ভাঙন ঝুঁকি ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

ভৈরব পৌরসভা নদী-ভাঙনের কবল থেকে মুক্ত তবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত নদীর বাঁধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন বিবেচ্য। এ এলাকায় উন্নয়নের জন্য জল-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ সহ সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহন করলেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১০.৩.৪ খরা অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা সবই বিদ্যমান। বর্তমানে গুরুতর না হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই ভয়ঙ্কর সময়ে খরাকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

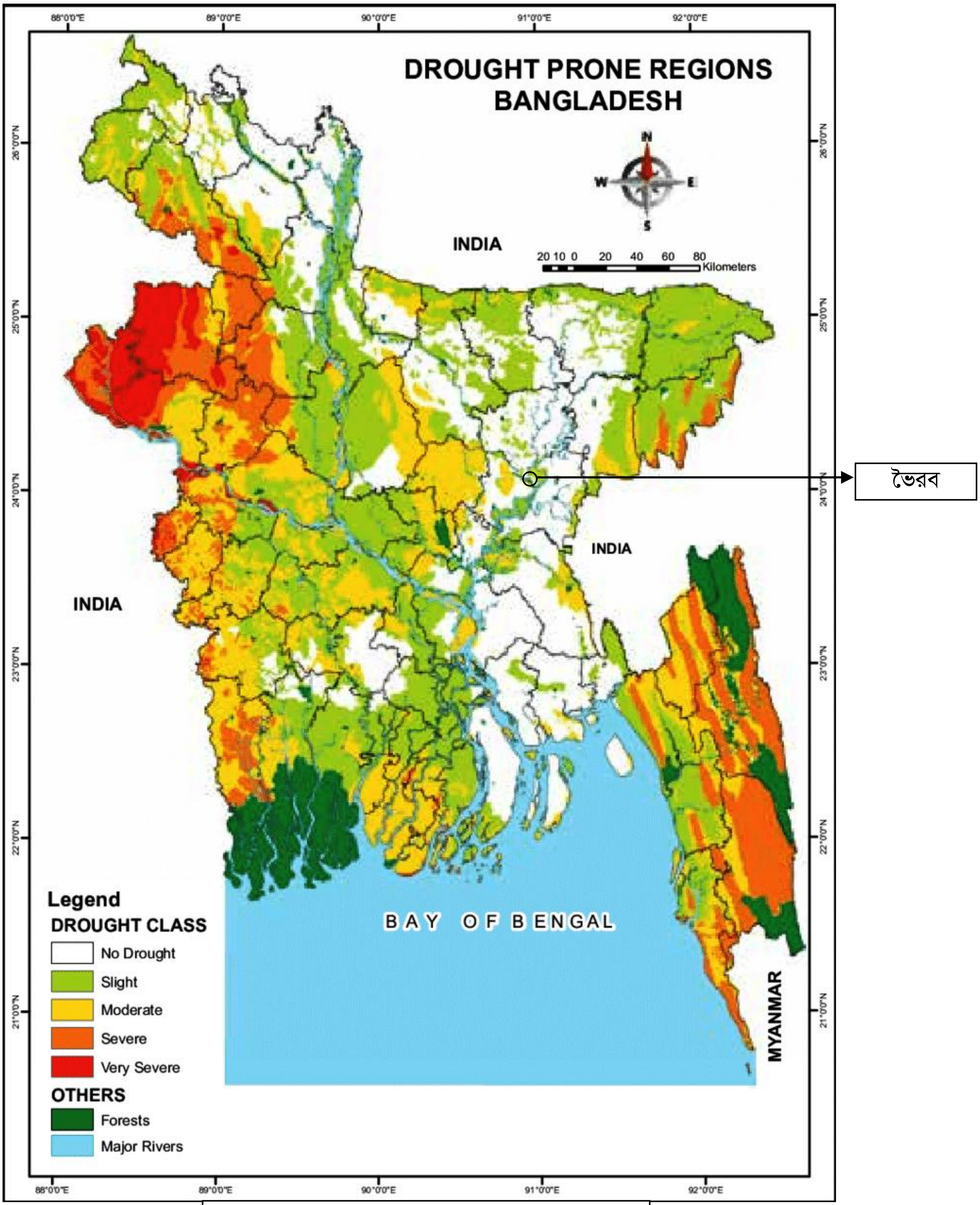

চিত্রঃ খরা জোনিং ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **ভৈরব পৌরসভা "জোন ১ঃ No Drought "** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ খরা সংক্রান্ত বিষয়ে ভৈরব পৌরসভা কোন **ঝুঁকিতে নেই**।

১০.৩.৫ আর্সেনিক ঝুঁকিঃ

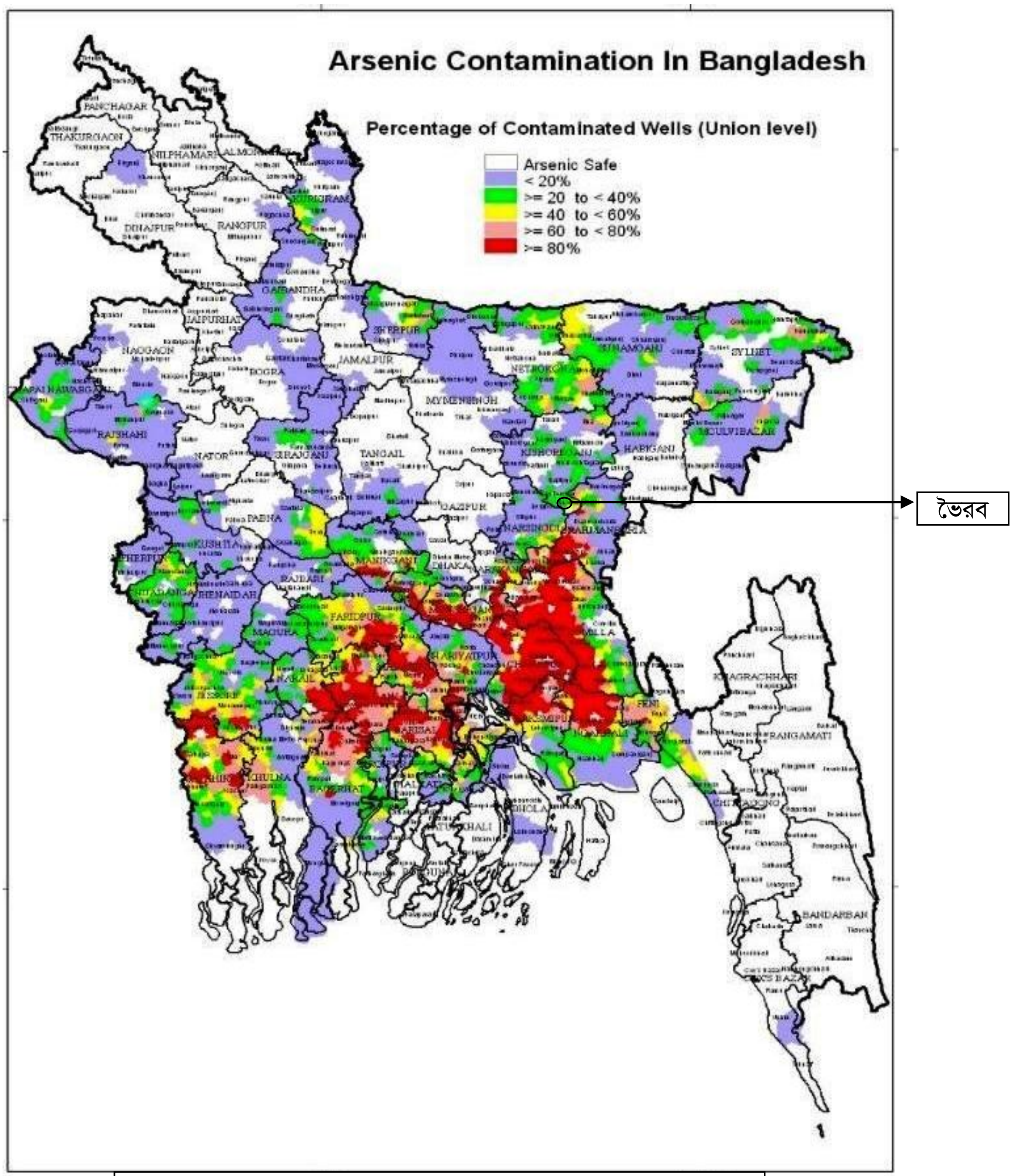

চিত্রঃ আর্সেনিক কন্টামিনেশান জোনিং ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে প্রদর্শিত অবস্থান অনুযায়ী, **ভৈরব পৌরসভা** অঞ্চলে **আর্সেনিক ঝুঁকি নেই বললেই চলে**। তবে স্থানীয়ক্ষেত্রে কতিপয় অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় দু'একটি ক্ষেত্রে আর্সেনিক উপস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে। এই বিবেচনায় এবং পানি আমাদের জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অনুসঙ্গ হওয়ায়, গভীর/অগভীর নলকূপ এবং উত্তোলন পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পন্ন করেই সেটা করা উচিত হবে।

১০.৩.৬ সাইক্লোন ঝুঁকিঃ

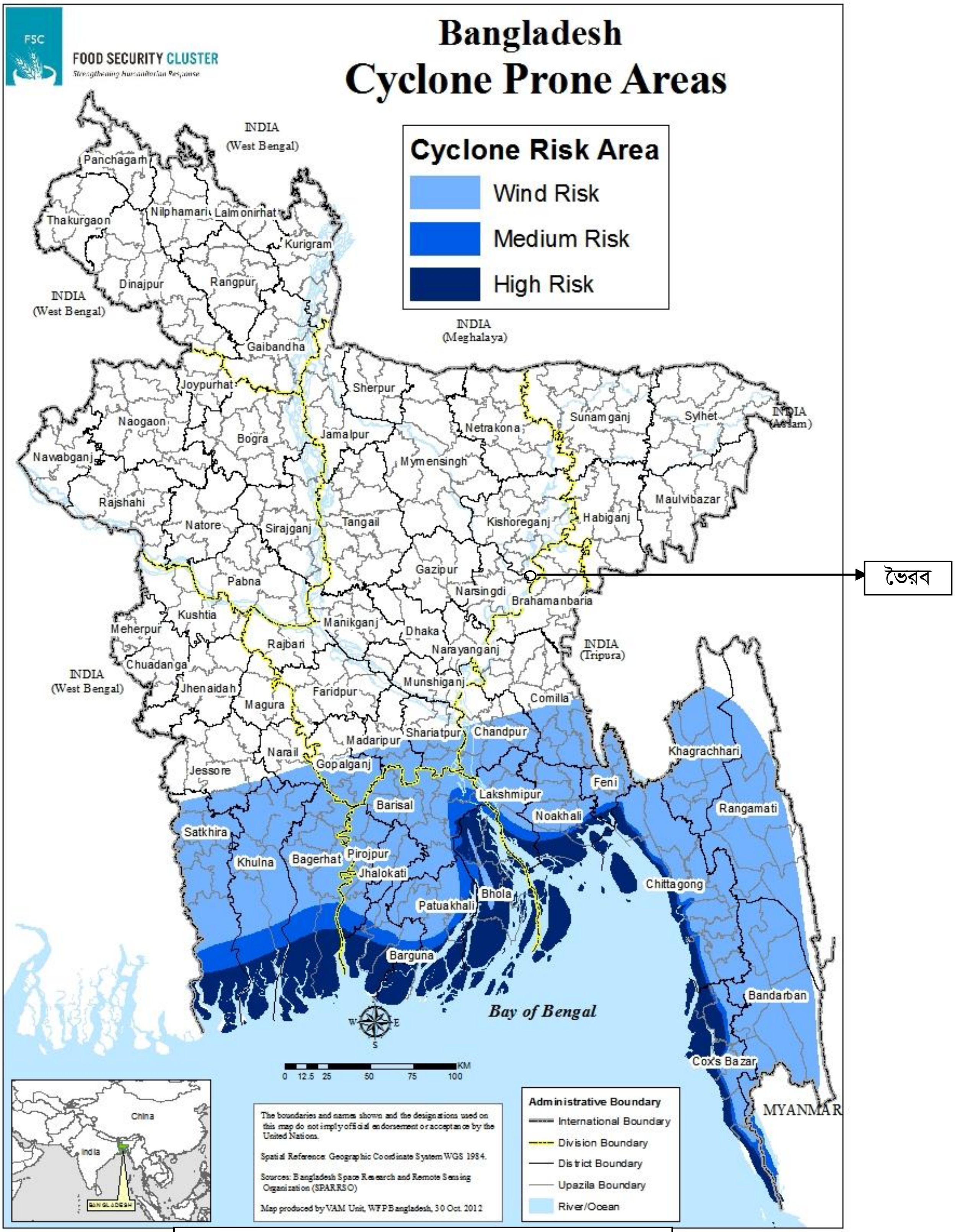

চিত্রঃ সাইক্লোন-রিস্ক ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী ভৈরব পৌরসভা কোনো রিস্ক জোনের মধ্যেই পড়ে নাই এবং এটা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাইক্লোন সংক্রান্ত কোনো ধরনের ঝুঁকির (জলোচ্ছাস, ঝড়) মধ্যেই ভৈরব পৌরসভা এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত কোনো বিশেষ পূর্ব-সতর্কতা (Precaution) এর প্রয়োজন নেই।

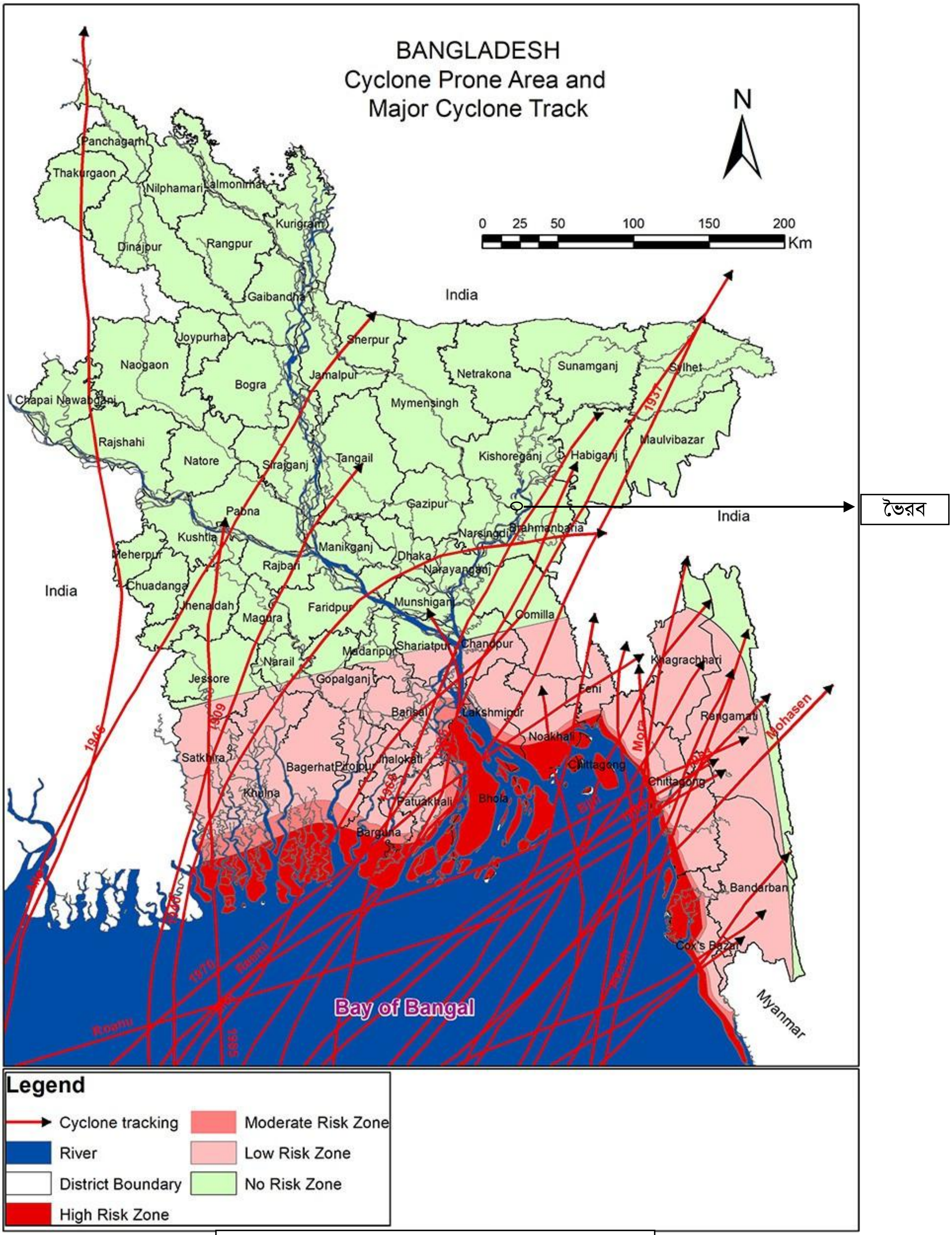

চিত্রঃ সাইক্লোন ট্র্যাকিং ম্যাপে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

অবস্থান অনুযায়ী, **ভৈরব** পৌরসভার কোন অংশই **" উচ্চ বায়ুপ্রবাহ জোন (High Wind Flow Zone)"** এবং এর অবস্থান **"No Risk Area"** তে হওয়ায় সাইক্লোন এ অঞ্চলের উন্নয়নে বেশী প্রভাব রাখবেনা।

এছাড়াও স্থানীয়ভাবে পরিবেশগতভাবে আমরা অহরহ যে সকল প্রতিকুল পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হয়, তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১০.৪ দূষণ

১০.৪.১ পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। ভৈরব পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল দূষিত হচ্ছে অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে। পৌরসভার প্রকৌশলী মহোদয়ের দাবী মতে পৌরসভায় প্রায় ৪০ শতাংশ শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত। পানি দূষণের আরেকটি উৎস হল হাসপাতাল বর্জ্য। পৌর এলাকায় একটি হাসপাতাল ও ৬টি প্যাথলজিকাল পরীক্ষাগার রয়েছে যেখানে বিভিন্ন জীবানুসমৃদ্ধ বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসকল বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার নিজস্ব কোন ব্যবস্থা হাসপাতালের নেই। এছাড়াও বসতবাড়ী ও অন্যান্য উৎসের বর্জ্য প্রায়শ:ই উন্মুক্ত স্থান, কোথাও কোথাও সড়কের পাশে, সেতু/কালভার্টের নিচে, অন্যান্য নিচু জায়গায় অপসারণ করা হয়। বর্ষা মৌসুমে এসকল বর্জ্য পানির সংস্পর্শে আসে যা পানি দূষণের অন্যতম কারণ। পানি দূষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও পোকামাকড় দমনের ঔষধের ব্যবহার। ফসলের ক্ষেত থেকে এসকল পদার্থ খাল ও নদীর পানিতে মিশ্রণের মাধ্যমে পানি দূষিত হয় যা বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এধরণের দূষণ জলজ জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার উৎপাদিত খাদ্য পণ্যে রাসায়নিক পদার্থের পরিমান এই পরিমান বাড়য়ে দেয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পৌরবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি। নগরবাসী হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করে। পৌর এলাকায় ৩৯৮২টি পরিবার বসবাস করে। পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা শীত মৌসুমে ১০ ফুট পর্যন্ত থাকে যা গ্রীষ্ম মৌসুমে ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমানে আয়রন রয়েছে। হস্তচালিত নলকূপগুলোতে মিশ্রিত আয়রন এবং ক্ষতিকারক খনিজ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারন। শীতকালে হস্তচালিত নলকূপগুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। পানির স্তর অতিরিক্ত নিচে নেমে যাওয়ায় (৭০-৮০ ফুট) এসময় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, পানিতে লোহার পরিমান অত্যধিক বেড়ে যায় যা পৌরবাসীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের একটি সম্ভাব্য উৎস হলো পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূগর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূস্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভায় কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সনাক্ত করেছে। সেসব স্থানে দূষিত নলকূপের পরিবর্তে নতুন নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১০.৪.২ বায়ু

ভৈরব পৌরসভায় বায়ু দুষণের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, যানবাহন, বর্জ্য ফেলার স্থানসমূহ, কিছু শিল্প কারখানা, নির্মাণ কর্মকান্ড যেসকল স্থান থেকে ক্ষতিকর কণা নির্গত হয়। দ্রুত নগরায়নের ফলে ভৈরব পৌরসভায় যান্ত্রিক যানবাহনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, ঢাকা-ব্রাহ্মনবাড়িয়া মহাসড়ক ভৈরব পৌরসভার ভিতর দিয়ে যাওয়ায় এখানে যানবাহন চলাচলের পরিমান অত্যন্ত বেশী। ভৈরব পৌরসভায় চলাচলকারী স্থানীয় বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যান্তিক যানবাহন দীর্ঘদিনের পুরানো, রক্ষণাক্ষেণ পর্যাপ্ত ও যথাযথ না হওয়ায় এসকল যানবাহন থেকে নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশী বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় যা বায়ু দূষণের একটি কারণ। উন্মুক্ত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় যা দূর্গন্ধ সৃষ্টি করে। করাত কল ও ধান কল থেকে ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। ইটভাটা, ধানকল প্রভৃতি থেকে চিমনীর মাধ্যমে কালো ধোঁয়া তথা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি নির্ভরশীল কী ধরণের ক্ষতিকর কণা/পদার্থ, বায়ুতে তাদের পরিমান ও মাত্রা, মানুষের বয়স স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভৃতি সূচকের উপর। মানুষের ক্ষতি ছাড়াও বায়ু দূষণ পশুপাখি,

গাছপালা ও বস্তুসংস্থানের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বায়ু দূষণের ঝুঁকি মোকাবেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়মিত বাতাসের মান পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

১০.৪.৩ শব্দ

ভৈরব পৌরসভায় শব্দ দূষণের পরিমান উল্লেখ করার মতো। পৌরসভার অভ্যন্তরে রেলস্টেশন থাকায় তা শহরে উচ্চমাত্রার শব্দদূষণ সৃষ্টি করে। সবমিলিয়ে পৌর এলাকায় ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, তেলের মিল, করাত কল, ছাপাখানা, বরফ কারখানা, বেকারী এবং হালকা প্রকৌশল ওয়ার্কশপ। এদের মধ্যে করাত কল ও প্রকৌশল ওয়ার্কশপ যথেষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে। চলন্ত যানবাহনের সৃষ্ট শব্দেও কিছু মাত্রায় শব্দ দূষণ ঘটে। এছাড়াও হাটের দিনে পণ্য বেচা কেনার জন্য প্রচুর যনবাহন ও লোকসমাগম হয় যার ফলে কিছু পরিমান শব্দ দূষণ ঘটে। বাজার এলাকায় কাঠের দোকান, দর্জির দোকান ও কামারের দোকন থাকায় এগুলো যথেষ্ট পরিমান শব্দ সৃষ্টি করে।

১০.৪.৪ জলাবদ্ধতা

ভৈরব পৌর এলাকার কয়েকটি স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পানি নিষ্কাশনে সড়কে নির্মিত সেতু, কালভার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যত্রতত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করা। জলাবদ্ধতার সমস্য মূল শহর এলাকায় বেশী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জলাবদ্ধতা সেই সব এলাকায় ঘটছে যেখানে বাড়ীঘর সড়কের উচ্চতা থেকে কম উচ্চতায় ও পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা নর্দমা ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টির পানির ক্ষুদ্র একটি অংশ বাষ্পীভবন ও মাটিতে শুষে নেয়র পর বৃহৎ অংশ নিষ্কাশনের অভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সপ্তাহব্যপী স্থায়ী হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা সাধারণত জুনের শেষ দিকে আরম্ভ হয় অক্টোবর পর্যন্ত এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

১০.৪.৫ অগ্নিকান্ড

অগ্নিকান্ড দূর্যোগ সেই অবস্থা যেখানে অগ্নিকান্ডে মানুষ, সম্পদ ও স্থাপনার স্বাভাবিকের থেকে বহুগুণ বেশী ঝুকি থাকে ও এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভৈরব পৌরসভা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের দূর্যোগের কবলে পড়ে যেমন; বন্য, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড বা অন্যান্য মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ। অগ্নিকান্ড যেখানে হয়, সেখানে শুধু ভৌত ক্ষতি হয়না, মারাত্মকভাবে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণভাবে অগ্নিকান্ড ঘটে ঘনবিন্যস্ত নগর এলাকায়, যেখানে বাড়ীঘর একটির সঙ্গে অপরটি অত্যন্ত লাগোয়া, অপ্রশস্ত সড়ক, বাড়ী নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, ভবনে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তারেরস গুনগত অবস্থা প্রভৃতি। এছাড়াও পানির স্বল্পতা, দক্ষতা ও সচেতনতার অভাব, এসকর সমস্যা উত্তরণে অর্থের অভাব প্রভৃতি ধীরে ধীরে অগ্নিকান্ডকে দুর্যোগে পরিনত করছে। সাধারণত: বিপনীবিতান, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বা জনসমাগম স্থানে অগ্নিকান্ড ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। অসচেতনতা, ইমারত নির্মাণে যথাযথ বিধি পালন না করা, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক উপকরণ ব্যবহার, অপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করা, অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দিন দিন অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ও এর থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়েই চলেছে। অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের তথ্য মতে ভৈরব পৌর এলাকায় এখনো পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনা ও হার অত্যন্ত কম। গৃহ নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, জ্বালানী হিসাবে কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহার মাঝে মাঝে এখানে বিপদের কারণ হয়।

১০.৪.৬ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জনসংখ্যার কম ঘনত্ব ও সম্পদ ব্যবহারের নিম্ন হারের কারণে এই শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনত্ব বাড়বে। সুতরাং বর্জ্য ভবিষ্যতে প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যৎ সমস্যা বা বিপর্যয় এড়াতে আগে থেকেই সতকর্তামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত এবং শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে চুড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৌরসভার একদম পূর্ব প্রান্তে একটি বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধানে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রর্বতন করা উচিত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসহ (সিবিও) পৌর কর্তৃপক্ষ বসতবাড়ি ও অন্যান্য বর্জ্য সৃষ্টিকারী স্থান থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ভ্যান যাবে

এবং হুইসেল দিয়ে আগমন ঘোষণা করবে। একই যান অন্য প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি এবং কমপ্লেক্সগুলোর বর্জ্য অপসারণ করবে। এভাবে এই ব্যবস্থা পুরো শহরের বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বর্জ্য স্থানান্তর স্থানে জমা করবে। পরিশেষে সকল বর্জ্য প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রে ফেলা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ বর্জ্য সংগ্রহ কাজে বাসিন্দাদের উপর ন্যূনতম ফি ধার্য কর নিম্ন বর্নিত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে। ।

- নিরসণমূলক পদক্ষেপ
- প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা;
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্জ্য স্থানান্তর স্থান স্থাপন;
- বর্জ্য অপসারণের জন্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন;
- স্বাস্থ্যকর মাটি ভরাট পদ্ধতিতে অপসারণ কেন্দ্রে বর্জ্য পরিশোধন;
- উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় ও সংশ্লিষ্ট উপাদান সুরক্ষা পরিকল্পনা

১০.৪.৭ উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ

বর্তমানে এখানে প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য উন্মুক্ত স্থানের হার অতি নগণ্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৩১ সালে এই হার হবে ০.৫৭ একর। তবে এখানে অতিরিক্ত উন্মুক্ত স্থান স্থাপন করার তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- প্রস্তাবিত পদক্ষেপ
- ✓ শহরের ভবিষ্যৎ পরিবেশ রক্ষায় উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ✓ উন্মুক্ত স্থানের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করতে হবে;
- ✓ মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত উন্মুক্ত স্থানে কোন ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;
- ✓ উন্মুক্ত স্থান স্থাপনের জন্য জমির মালিকদের জমি দান করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

জলাশয়/নিম্নভূমি সংরক্ষণ: ভূমিগ্রাসীরা পৌরসভার মধ্যকার প্রায় সবগুলো খালই অবৈধভাবে দখল করে ফেলেছে। অনেক স্থানে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এর ফলে খালগুলো সরু হয়ে বর্ষাকালে তাদের জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পৌরসভায় বন্যা ও নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়বে। নিম্ন বর্নিত উপায়ে দখলকৃত জলাশয় ও নিম্নভূমি উদ্ধার করা যেতে পারে।

- ✓ দখলারদের হাত থেকে খালসহ যে কোন জলাশয় উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে;
- ✓ যেখানেই খাল ভরাট করা হয়েছে সেখানে তা পুন:খনন করে দখলমুক্ত করতে হবে;
- ✓ সীমানা স্তম্ভ স্থাপন করে খালের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে;
- ✓ খাল এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির মাঝখানে বৃক্ষরোপন করে বাফার অঞ্চল তৈরি করতে হবে।

১০.৫ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

১০.৫.১ শিল্প

আজকের দিনে শিল্প দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী। পরিবেশগত পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল এমন একটি ভৌত পরিবেশ গড়ে তোলা যা এখানকার প্রতিটি পরিবার ও সমাজের জন্য সহনীয় ও আরমদায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হল এই পর্যায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পৌর এলাকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প দূষণ

থেকে মুক্ত রাখতে সালতিয়া সড়কের পাশে ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে একটি শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এই শিল্প এলাকা স্থাপনে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমান ৪৮.৬৪ একর। বর্তমানে যে সকল শিল্প আবাসিক বা অন্যান্য পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় পুনর্বাসন/স্থানান্তর করবে। সাধারণ শিল্প (সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত) এবং ভারী শিল্প (কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত) স্থাপনে নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তা নিম্নরূপ:

- ✓ যথাযথ অঞ্চলীকরণ শিল্প স্থাপনা যথাযথ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে বসবাসের পরিবেশের মানোন্নয়ন করা
- ✓ প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার চারপাশে বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে বসবাসের এলাকা নিরাপদ করা,
- ✓ শিল্পাঞ্চলের জন্য গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা,
- ✓ দূষণ বিষয়ক বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ✓ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যকর ফল দিতে পারে। নগর সমস্যা সমাধানে সবথেকে ভালো উপায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।
- ✓ নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:
- ✓ পৌর এলাকার ভিতরে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা,
- ✓ চলমান সকল শিল্পকে প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তর,
- ✓ নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যেন শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয়গুলো নিরসণে যথাসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যেসকল শিল্পের কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটবে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা,
- ✓ নিয়মিত শিল্প স্থাপনা পরিদর্শন করা যেন দূষিত পদার্থের নির্গমণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- ✓ শিল্প স্থাপনে স্থান নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হল: শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা, বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ের প্রবর্তন নিয়ন্ত্রণ আরোপ
- ✓ শিল্প বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল বর্জ্যের ধরণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাধারনত: এমন পরিশোধন প্রস্তাব করা হয় তা যেন কিছু ব্যবহার উপযোগী উপাদান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা শিল্প মালিকাদের পরিশোধনাগার স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং পরিশোধন ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

১০.৫.২ বায়ু/পানি/মাটি/শব্দ সংক্রান্ত

➢ **বায়ু**

প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ গড়ে ২০০০০ লিটার বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় দূষিত পদার্থ গ্রহণের ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু ভৈরব পৌরসভায় দূষিত বায়ু কণা যেমন সিএফসি, ভারী ধাতব কণা, এসপিএম প্রভৃতি নি:সরণের মতো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং যানবাহনের সংখ্যাও সীমিত ফলে পরিকল্পনায় বায়ু দূষণ নিরসণে আলাদা করে কোন প্রস্তাবনা দেয়া হয়নি।

➢ **পানি**

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। ভৈরব পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণ বহুমাত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটা করার সবথেকে ভালো উপায় হলো দূষিত পানিকে বিভিন্ন রাসায়নিক সহযোহে পরিশোধন করা এবং একে বিষমুক্ত পানিতে রুপান্তর করা। পানিতে অক্সিডেশন পানির স্বল্প মাত্রার রেডিওএকটি দূষণ মুক্ত করে। বেশ কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক রয়েছে যারা পানিতে জৈব ব্যকটেরিয়ার কাজ করে এবং এগুলো কীটপতঙ্গ নিধনে পেষ্টিসাইড হিসাবে ব্যবহৃত

হয়। এছাড়া পানি দূষণের অন্যান্য কারণ ময়লা আবর্জনা, হাসপাতাল বর্জ্য, রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে সারের পরিমিত ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভূমি দূষণ হল মানুষের কর্মকান্ড ও অপব্যবহারের কারণে কোন এলাকার ভূস্তর বা মাটি দূষণ। এটা সাধারণত: ঘটে যখন ময়লা আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে অপসারণ করা না হয়। নগরায়ন ও শিল্পায়ন ভূমি দূষণের অন্যতম কারণ। মাটি দূষণ হল মাটিতে কঠিন বা তরল দূষিত পদার্থের মিশ্রণ যা মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট কওে এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ভূমি দূষিত করে এমন বিভিন্ন শ্রেণির পদার্থের ধরণের মধ্যে রয়েছে পৌর বর্জ্য, নির্মাণ ও ভেঙ্গে ফেলা বর্জ্য, বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর বর্জ্য প্রভৃতি। পৌর বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে অক্ষতিকর ময়লা আবর্জনা, বসতবাড়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, খাবারের বর্জ্য, বাজারের বর্জ্য প্রভৃতি।

- **শব্দ**

শব্দ দূষণ মূলত মানুষ, প্রাণি বা যন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও প্রাণি জগতের কাজকর্ম ও ভারসাম্যের বিপত্তি ঘটায়। জল ও বায়ু দূষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সঙ্গে শব্দ দূষণ ও পৌর নাগরিকদের কাছে নতুন হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। শব্দ দূষণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রয়েছে যেমন: উচ্চরক্ত চাপ, মানসিক চাপ, তন্দ্রাহীনতা। উচ্চমাত্রার শব্দ নগরবাসী বিশেষ ক'রে শিশুদের শ্রবণে ও স্নায়ূতন্ত্রে মারাত্মক চাপ তৈরি করতে পারে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্যদেও তুলনায় প্রচুর উচ্চ মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে। শহর এলাকায় মোটরচালিত যান অন্যতম প্রধান শব্দ দূষণের উৎস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হয় সেখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রহণীয় মাত্রার চেয়ে বেশী মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে সেখানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ✓ শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিনের জন্য শব্দ নিরোধ ঘর নির্মাণ,
- ✓ কর্কশ ও তীক্ষ্ম শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ,
- ✓ শব্দ সৃষ্টিকারী শিল্প ও রেলস্টেশন আবাসিক এলাকা থেকে দুরে স্থানান্তর,
- ✓ জনসাধারনের মধ্যে প্রচারের সাধারণ যন্ত্র যেমন: মাইক প্রভৃতির অপব্যবহার রোধে যথাযথ আইনের প্রয়োগ,
- ✓ স্কুল, কলেজ, হাসপাতার প্রভৃতি স্থানে 'নি:শব্দ এলাকা' ঘোষণা ও মানতে বাধ্য করা,
- ✓ সড়কের পাশে বৃক্ষ রোপণ
- ✓ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাউড স্পকার নিষিদ্ধ করা।

১০.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন; বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতি জীবনহানিসহ পরিবেশ, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ভরশীল আক্রান্ত এলাকার মানুষ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা। মূলত: দূর্যোগ তখন হয় যখন আপদ (হ্যাজার্ড) ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতিক্রম করে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। প্রাকৃতিক আপদ যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে তবে তাকে দূর্যোগ বলা হয় না।

- ✓ **আপদ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদৰেপ)**

সকল জনপদের বিশেষত: দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগে আক্রান্ত ঝুঁকি (ভালনারেবিলিটি) মোকাবেলা ও গ্রহণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১০ সালে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫

প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংযোগ রেখে পৌরসভা দূর্যোগ মোকাবেলা কমিটি ‘ পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করবে।

✓ আপদসৃষ্টিকারী দখল মোকাবেলা পরিকল্পনা

দখল শব্দটি বন্যা আপদ ও নিষ্কাশন প্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। কতিপয় মানুষ তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প বা অন্য প্রতিষ্ঠান অনোনুমোদিত স্থান বা নদী, খাল, জলাশয়, নর্দমা প্রভৃতির আংশিক দখলপূর্বক নির্মাণ করেছেন যার ফলে পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এধরণের বাঁধার ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না ও তাৎক্ষনিকভাবে জলাবদ্ধতার ও দীর্ঘমেয়াদে বন্যার সৃষ্টি করে। সকল ধরণের অবৈধ দখল অপসারণ করতে হবে।

✓ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রয়োগযোগ্য প্রথম ও মুখ্য আইন হল “পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫” এবং পরবর্তী আইন হল “পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৬ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরকে আইনের বিধি- বিধান প্রয়োগ ও বিভিন্ন দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগসহ কার্যকার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বিভিন্ন ধরণের দূষণ প্রতিরোধে এসকল আইন কার্যকরী হাতিয়ার। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর আওতায় সকল শিল্প ও প্রকল্পকে তাদের কার্যক্রম বিবেচনায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছেঃ সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপন অনুমোদনে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যিক করণ ও এই শ্রেণি অনুযায়ী শিল্প স্থাপনায় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারে।

ভৈরব পৌর এলাকায় দূষিত গ্যাষ ও বিষাক্ত গ্যাসীয় কণা নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও মোটরযান বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগ করতে পারে। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা বিভাগ পৌর এলাকার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণীত হলেও এসকল নীতিমালা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক বিধি বা নির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা নিজেদের মত করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে যা সবসময় কার্যকর হয়না। বাংলাদেশ মাত্রাতিরিক্তভাবে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ ও এর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা মিলে এই সম্পদ দ্রুত নি:শেষ করে ফেলছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। ব্যপক মাত্রায় তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ, সংরাপ, সভা, আঞ্চলিক কর্মশালা, পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সংলাপের মাধ্যমে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনায় পরিবেশ বিষয়ে বেশ কিছু কার্যক্রমকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং সরকার জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করছে।

১০.৭ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, বাস্তবায়ন হল কোন পরিকল্পনার প্রয়োগ। কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বা'স্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভূলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনার কার্যকর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

১০.৮ উপসংহার

বিভিন্ন ঝুঁকি জোনিং ম্যাপে পৌরসভার অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যাপারে ভৈরব তুলনামূলক নিরাপদে রয়েছে। তবে মানবসৃস্ট দুর্যোগ (বিল্ডিং ধ্বস, বন উজারের কারনে ভূমিক্ষয়, পরিবেশের অবক্ষয়জনিত অবাসযোগ্য শহর ইত্যাদি) সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে খুব সামান্য পদক্ষেপ যেমন অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বে ভূমিকম্প-সহনীয় (মধ্যম মাত্রার) কাঠামো নির্মাণ, জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় জল-নিরোধক/জল-সহিষ্ণু কাঠামো নির্মাণ, পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমেই ঝুঁকিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই, ভৈরব পৌরসভা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর।